International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-III, Issue-III, April 2017, Page No. 49-57
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পঞ্চগ্রাম', 'গণদেবতা' ও 'কালিন্দী' উপন্যাসে গোমস্তা, নায়েব ও লাঠিয়াল চরিত্রের ভূমিকা

মুস্তাক আহমেদ
সহ-শিক্ষক, পাঁচবেরিয়া হাইস্কুল (উঃমাঃ), নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

In novel and short story Tarashankar Bandyopadhyay has selected the character of Zaminder with his supporting characters like citizen collectors, steward, men who fight with stickwith great reality. But in the novel like 'Panchogram', 'Ganodevata' and 'Kalindi' the expansion of such characters are attractive and on the basis of reality, such characters are decorated with artistic way. Among the whole village, the people belong to Zaminder class are emerged into darkness, by the subjects of this village through the exploitation of the small farmers. Though the common people surrender everything, yet they do not get relief from the severe pain of hell. It proves in every page. Many times such exploitation of citizen collectors, steward, men fight with stick has crossed the limit of Zaminder. They are forcefully compelled to obey their rules and regulation. Tarashankar tries to realize and search the said characters with his own creativity and reality.

To establish the Zaminder and to enrich his wealth the main dependable and believable characters are citizen collectors, steward and men who fight with stick. To protect the Zamindari, the rules and regulations of collecting tax, to protect the land and in the field of giving advice the characters of citizen collectors, steward and men who fight with stick are inevitable. To realize the attitude of the subjects they help the Zaminder to lead him how to rule over through the new rules and principles. Tarashankar Bandyopadhyay depicts beautifully in his writings the exploitation and torture above the small farmers by the men who fight with stick and they became economically looser. Small farmers used to snatch the property or land of small farmers and after taking many conspiracies they ultimately drove out the said farmers. In the novel like 'Panchagram' the protesting character like 'Tinkari' proves it. In 'Kalindi' novel, they did not give the documents of taxes of 'Santals'. Steward 'Jogesh Mazumder' tries to engulf the total money of Chakraborty Zaminder and turns him rootless. Beside this, the samrat of merchants 'Bimal Mukherjee' is not an exceptional character. So, the lives of the people like 'Nani Paul', 'Kalu Bagdi' and 'Ranglal' become more and more critical than before. If the subjects became furious after increasing the tax amount, they solve the problem by the men who fight with stick with t heir wild like torture. Even they are also victimized by the courtcase. So, it is to say that Tarashankar

Bandyopadhyay boldly steps his foot on this contemporary sight and depicts the pathetic corner through these characters.

উপনদী যেমন সমুদ্রে মিশে সমুদ্রের গতিবেগকে খরতর ও তীব্রবাহী করে তোলে ঠিক তেমনি গোমস্তা, নায়েব শ্রমিক শ্রেণির চরিত্রগুলিও সমন্বিত হয়ে জমিদার চরিত্রকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসে প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালিয়ে যায়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমস্ত উপন্যাসে তাই এই শ্রেণির চরিত্র মালা বন্ধন করেছেন। 'পঞ্চগ্রাম', 'গণদেবতা', 'কালিন্দী' প্রভৃতি উপন্যাসে যেমন লক্ষণীয়, তেমনি জলসাঘর, রায়বাড়ি ও অন্যান্য ছোটগল্পেও তার প্রমাণ মেলে। চরিত্রগুলি তাদের আপন কাজে অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও পারদর্শিতার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আপন মহিমায়। শোষক জমিদারদের কীভাবে সন্তুষ্ট করা যায় বা রাখা যায় তার চেষ্টায় সর্বদা লিপ্ত থেকে নিজেদের আসনকে যথাসম্ভব পাকা করার প্রয়াস চালিয়েছে নিরন্তর। লোভ, লালসা, নির্লজ্জতার চরম প্রকাশ মুহুর্মুহু ফুটে উঠেছে ব্যক্তি চরিত্রে। আপন স্বার্থকে প্রতিষ্ঠিত করতে যা করার তাই করেছে গোমস্তা, নায়েব ও লাঠিয়ালরা। নায়েবদের প্রতাপান্বিত আচরণ অনেক সময় জমিদারের নির্মমতাকে ছাপিয়ে গেছে। গোমস্তা প্রজাসকলের উপর চাপ দিয়ে, হুমকি দিয়ে, ভয় দেখিয়ে খাজনা আদায় করেছে। খাজনা না দিলে তার স্থাবর ও অস্থাবর ক্রোক করার পরামর্শ দিয়েছে জমিদারদের। প্রয়োজন মতো লাঠিয়ালদের ব্যবহার করেছে। ভয়, হুমকি দেখিয়ে কাজ না হলে লাঠিয়ালদের দিয়ে প্রজা সাধারণের উপর জোরপূর্বক বিভিন্ন নিয়মনীতি মানতে বাধ্য করেছে। কখনো আবার হাতে না মেরে ভাতে মারার চেষ্টা করেছে।

গোমস্তা:

'গোমস্তা' একটি জমিদারী রক্ষণাবেক্ষণের কর্তৃত্ব ব্যক্তি। তবে শব্দার্থ হিসাবে গৃহীত রয়েছে – 'যে কর্মচারী জমিদারী বা চালকের অংশ ডিহী মৌজা প্রভৃতির খাজনা আদায় করেন।' আবার পদকার্য নামও দেওয়া হয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অধিকাংশ লেখনীর মধ্যে গোমস্তা শ্রেণির পদস্থ ব্যক্তিদের ক্রিয়াশীল ভূমিকা তুলে ধরেছেন একাধিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। জমিদারের জমিদারত্বকে সঠিকভাবে চালনা করার ক্ষেত্রে গোমস্তার ভূমিকা ছিল সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় আদায়কার্য চালিয়ে যাওয়া ও জমির রক্ষাকর্তা হিসাবেই এঁদের মূলত পরিচিতি। নিয়মভাবে খাজনা আদায় ছাড়াও জমিদারী সম্পর্কে নানা পরামর্শ, সহায়তা, প্রয়োজনে খাজনা বৃদ্ধি, প্রজাদের শাস্তি, লাঠিয়ালদের ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা ছিল। এছাড়াও জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজাদের মনোভাব, ক্ষোভ, অনাচার এর খবর জমিদারের কাছে পৌঁছে দিতেন। জমিদারের নাম করে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য তা অধিক পরিমাণে লাভবানের আশায় প্রজাদের উপর শাসন কায়েম করার প্রয়াস নিয়ন্ত্রণ চালানোর অভিপ্রায় লব্ধ ছিল। জমিদারী শোষণের প্রক্রিয়াগুলি আর কঠোর ও কঠিন ভাবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে আগ্রহ ছিল বেশি। ফলে শোষণের মাত্রা বেড়েই চলত ক্রমান্বয়ে। একদিকে জমিদারের শোষণ ও দমন-পীড়নমূলক নিয়ম-নীতি, অত্যাচার, অন্যদিকে তাদের পারিষদদের শোষণ ও নিপীড়ন প্রজাদেরকে কীভাবে সামাজিক, অর্থনৈতিকভাবে বিকলাঙ্গ করে দিত তার চিত্র তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস ও ছোটগল্পের পরতে পরতে সন্নিবদ্ধ রয়েছে। তৎসম্বন্ধীয় প্রতিক্রিয়া ও জমিদারীর সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কগুলিকে আলোচনা করাই মূল লক্ষ্য। ভাগীদার, চাষী, কৃপণ সাধারণের উপরে ঋণের বোঝা চাপানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিপ্রায় থেকে 'দেড়ী' নামক প্রথার প্রচলন। যেসমস্ত কৃষক প্রজারা জমিতে ফসল ফলাত তাদেরকেই আবার খাদ্য হিসাবে ধান দিয়ে শতকরা পঞ্চাশ শতাংশ সুদ নেওয়ার প্রচলনই 'দেড়ী'।

মৌজা অনুযায়ী জমিদারীর দায়িত্ব গোমস্তাদের হাতে ন্যাস্ত থাকে। 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসে পত্তনীদার থেকে জমিদার হয়ে ওঠা শ্রীহরি ঘোষ একজন গোমস্তার পরিবর্তে দু'জন গোমস্তার প্রয়োগ করেছেন। তাদের দিয়ে কাগজপত্র প্রস্তুত করে জমিদারী বৃদ্ধির বন্দোবস্ত করেছে। ওয়ারিশহীন ব্যক্তির সম্পত্তির মালিক জমিদার। জমিদারের শক্তিকে রাজশক্তিতে রূপান্তরিত করা ও প্রজার কাজ জমিচাষ করা কিন্তু জমির নীচে খনি উঠলে কিংবা গাছ থাকলে, নদীর মাছ জমিদার পেয়ে থাকে। ভগবানের প্রতিভূ হিসাবে ইতিহাসে যেমন রাজার প্রতিষ্ঠা তেমনি রাজাই নাকি জমিদারের বিধান তৈরী করে রাজা গোমস্তাদের দিয়ে প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায় ও শাসন নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষ বন্যার কবলে পড়ে বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়লে অন্নহীন হয়ে পড়ে। দেবতারা পর্যন্ত এই অবস্থায় সেবা ভোগ পাবার আশায় ধনী ঘরে প্রবেশ করে। এতদ্‌সত্ত্বেও চণ্ডীমণ্ডপে গোমস্তা শ্রীহরি দাশজীকে বসিয়ে শুকিয়ে পকাটি হয়ে যাওয়া মানুষগুলির উপর যন্ত্রণা দেওয়ার পসরা সাজানোর পরিকল্পনা করেছে। ট্যাক্স আদায়ের শেষ তারিখ জানিয়ে গ্রামে ঢোল বাজিয়ে সতর্ক করে প্রচার চালিয়েছে – ট্যাক্সের জন্য অস্থাবর ক্রোক ও ট্যাক্স বৃদ্ধি ছাড়াও বিভিন্ন রকমের ঘোষণা করেছে। সাধারণ প্রজাদের বেঁচে থাকার কোনো উপায় নেই বলে সমাজের একটা শ্রেণির মানুষ আক্ষেপ করে বলেছে – 'কোন উপায়ই নাই? বাঁচিবার কি কোন উপায়ই নাই'।[১]

পাতুমুচির ভাগার জমিদার বন্দোবস্ত অন্যলোককে বন্দোবস্ত দিলে গোমস্তা নন্দীর কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কেননা পূর্বপুরুষ ধরে তারা এই কাজ করে আসছে আর আজ কিনা জমিদার বন্দোবস্ত দিয়ে দিয়েছে। সেটেলমেন্টকে কেন্দ্র করে গোমস্তা এবার মাঠে এসে পৌঁচেছে। সারা মাঠে পাকা ধানের উপর দিয়ে শেকল টেনে জমি জরিপ করেছে। বুট জুতো পরে ধান খেতের উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে মাপজোক করবে, তাই এবার মাঠেই ধান ঝাড়াই হবে বলে শংকা করে প্রজা ও চাষিরা। মহিলাদের উচ্চবিত্ত শ্রেণির মানুষ বণিক, জমিদার থেকে গোমস্তা, ভোগ্য পণ্যের মতো ব্যবহার করতে চেয়েছে। গোমস্তা ও ব্যাভিচারে সর্বদা লিপ্ত থাকতে চেয়েছে। গ্রামের বউ, মেয়েদের প্রতি অন্যায় অবিচার করেছে। নিজেদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা মেটানোর জন্য জোরপূর্বক অপব্যবহার করেছে। দুর্গা ছিরুপালের খামার বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় তার পাশের লোকটার বর্ণনা দিয়েছে – লোকটার চোখগুলো ভাঁটার মতো গোল – গোল, থ্যাবড়া নাক, নাকের পুরু মোটা একজোড়া গোঁফ, যে চেহারা দেখে মেয়েদের অস্বস্তির কারণ হয়েছে। তাদের চাহনি পশু সুলভ বর্বর যেন নিকৃষ্ট চিত্তের মর্মর ধ্বনি। গোমস্তা পদ্মকে দেখে তার পরিচয় জানতে চেয়েছে ছিরুপালের কাছে। ছিরুপাল প্রত্যুত্তরে জানিয়েছে – "আমি ও সব ছেড়ে দিয়েছি, দাশ মশায়"[২], গোমস্তা দাশ তার শিকারী গোঁফজোড়া নাচিয়ে শিকারী বন্ধু ছিরু পালকে সন্দেহ করে বলেছে তোমার মতো লোক এসব থেকে দূরে সরে রয়েছে, সেটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? তাই ছিরু পালকে গোমস্তা পরামর্শ দিয়ে বলেছে – 'বেশ তো, কামারণী তো আর নীচ-সংসর্গ নয়। সেটাকে যখন জব্দই করবে – তখন ঘরের হাঁড়িসুদ্ধ এঁটো করে দাও না'।[৩] দাশ নিজস্ব কায়দায় স্বভঙ্গিতে হাসতে শুরু করে। টাকা, পয়সা, ধন-দৌলত, সম্পদ শ্রীহরির রয়েছে তাই শ্রীহরি তো ভোগ করবেই। শ্রীহরি আবদার অনুযায়ী 'পাল' কেটে 'ঘোষ' বানিয়ে দিতে চায় কিন্তু গোমস্তা দাশজীর একটি কামনা রয়েছে সেই কামার বউ পদ্মকে তার প্রয়োজন। শ্রীহরি সদুত্তর জানিয়ে হাসতে হাসতে বলেছে – 'সে তো হবেই হে'।[৪] দীর্ঘাঙ্গী পদ্মার প্রতি গোমস্তা দাশজীর কামনা প্রগাঢ়, প্রচণ্ড আসক্তি।

চণ্ডীমণ্ডপে গোমস্তার কাছারি বসবে। সেবায়ত হিসাবে চণ্ডীমণ্ডপ জমিদারের সম্পত্তি কিন্তু সমস্ত মানুষের ব্যবহার করার অধিকার থাকবে গোমস্তা মশাই তা ঠিক করে দেন। আর চণ্ডীমণ্ডপ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব

সমস্ত মানুষের। সর্বসাধারণ নিজস্ব দায়িত্বে চাঁদা তুলে চণ্ডীমণ্ডপকে পুনরুজ্জীবিত করতে উদ্যত হয়েছে। জমিদারের বাড়িতে কাজের উপলক্ষ্যে পুকুরের জল বের করে মাছ ধরে। কিন্তু তা করলে প্রজারা পানীয় জল পাবে কোথায়? তার কথা না ভেবে গোমস্তা জানিয়েছে – ‘জমিদারের বাড়িতে কাজ, তিনিই বা মাছ কোথায় পাবেন’?[৫] তাই প্রজারা জমিদারের কাছে যাওয়ার পরিকল্পনা করলে গোমস্তা বলে হয় মাছ দিতে হবে নয় মাছের দাম দিতে হবে। চৌকিদার ভূপালকে গোমস্তা অনিরুদ্ধকে দেখা করার কথা জানাতে গেলে দেখা না পেলে তার কষ্টের শেষ থাকে না। বাড়িতে গিয়ে দেখা না পেলে বা লোককে ডেকে না পেলে গোমস্তা বলে – ‘শালা, বসে ভাত খাবার জন্য তোকে মাইনে দিই না’।[৬]

দেবু ঘোষকে নানা অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার কারণে গ্রেপ্তার হতে হয়েছে,। চণ্ডীমণ্ডপে গ্রামের সমস্ত লোক আসতে আসতে জড়ো হলে, সেখানে বসে গোমস্তা দাশজী ও শ্রীহরি ও ছোট দারোগা, মৃদুস্বরে আলোচনা করে বলেছে - দেবু পণ্ডিত হচ্ছে এই গ্রামের ছোটলোক চাষাদের আস্কারা দিয়ে জমিদার বিরোধী কার্যকলাপ সংঘটিত করেছে। সেই বার্তা গোমস্তা ছিরুর নিকট থেকে সাহেবের কাছে পৌঁছেছে। ছিরু পাল এই গ্রামের ধনপতি গণ্যমাণ্য ব্যক্তি। সে এখন জমিদারের গোমস্তা হয়েছে। একদিকে সে মহাজন তার উপরে আবার গোমস্তা। মানুষের জীবনের সর্বনাশ ডেকে এনেছে এবার। জমিদারের অবস্থা শোচনীয়, তাই শ্রীহরির টাকা আছে বা আদায় করে সমস্ত টাকা শ্রীহরি মেটাবে এই শর্তে আজ সে গোমস্তা। তার একসাথেই দুটো কাজ সম্পন্ন হবে – খাজনা বাকির নালিশে প্রজা সকলের জমি নিলামে তুলে সুদে আসলে আপন প্রাপ্য আদায় করবে। গণেশ পালের জমি নিলাম হয়েছে, আর কিনেছে শ্রীহরি গোমস্তা। তারিণীকে ভিটে থেকে পর্যন্ত উৎখাত করেছে, তেমনি পাতুও উৎখাত হয়েছে।

গোমস্তা ছিরু পাল নতুন নিয়মে তালগাছের পাতা কাটার অপরাধে চণ্ডীমণ্ডপে ভূপাল চৌকিদারকে দিয়ে ধরে নিয়ে এসেছে – পাতু, রামহরি, ফড়িং, পরি, বাঁকা ছিদাম ছাড়াও আর অনেকজন প্রজা ও চাষিকে। এতদিন তারা পূর্ব পুরুষের স্বত্ব অনুযায়ী গাছ কেটে এসেছে। কিন্তু আজ তাদের মজলিশ বসেছে চণ্ডীমণ্ডপে। গোমস্তা ভাব-গম্ভীর মুখে গড়গড়া টানতে টানতে বলেছে – চিরকাল অন্যায় করে আসছিস বলেও আজও অন্যায় করবি গায়ের জোরে? কাটিস, সেটা চুরি করে কাটিস।[৭] হরেন ঘোষালকে শ্রীহরি বুঝিয়েছে গাছের ফল ভোগ করতে পারে কিন্তু গাছ, পাতা কাটার অধিকার প্রজার নেই। জমিদারের সম্পত্তি বলে চণ্ডীমণ্ডপকে জমিদারের কাছারিতে পরিগণিত করেছে। চণ্ডীমণ্ডপ থেকে দেবু ঘোষের নেতৃত্বে গোমস্তাজী অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছে। ভূপাল চৌকিদারের পরিবর্তে কঙ্কনা গ্রামের বাড়ুজ্জেদের চাপরাশি নাদের সেখের ছেলে কালু সেখকে নিয়েছে। মহাজনদের মধ্যে সবথেকে বড় মহাজন গোমস্তা শ্রীহরি ঘোষ। মাঠের সমস্ত জমিই এখন তার অধীন। অনাহার ক্লিষ্ট, দুর্বল মানুষগুলিকে সে ধান কর্জ্জ দিয়েছে প্রজাদের রাগ করেও উপায় থাকে না, ক্ষুদার যন্ত্রণায় শিশু, মহিলাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। কৌশল ও কায়দা করে ফাঁদে ফেলার ষড়যন্ত্রে সর্বদা লিপ্ত থেকেছে। নবনিযুক্ত লাঠিয়াল কালু সেখ মনীবকে কাজ দেখানোর জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে – শ্রীহরির হুকুম রক্ষার তাগিদে। জমিদার-পতিত জমিতে বা সরকারী বাঁধে গরু প্রবেশ না করে। গরু ঢুকলে পাশের গ্রাম কঙ্কনার খোঁয়াড়ে দিয়ে আসে, সেকথা জানিয়েছে। তবে শ্রীহরির অনুগত লোকের গরু বাদ দিয়ে বাকি গরুগুলিকে খোঁয়াড়ের দেওয়ার নির্দেশ এসেছে।

জমিদার স-বিস্তারের ক্ষেত্রে গোমস্তা চরিত্রের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে 'কালিন্দী' উপন্যাসেও ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মূলত কালিন্দী নদীর চরকে কেন্দ্র করে জমিদারদের যে টানাপোড়েন তৈরী হয়েছিল তা নিরসন করার ক্ষেত্রে এক শক্তিধর ভূমিকা পালন করেছিল গোমস্তা চরিত্র। জমিদারদের নিরাপত্তা রক্ষা, জমি সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণাকে নিয়ে বিশ্লেষণ করে জমিদারী ব্যবস্থাকে পরিপুষ্ট করাতে সহায়তা করাই ছিল মূল লক্ষ্য। জমিদার চরের জমির মাপজোখ গোমস্তা পাঠিয়ে সাঁওতাল ও চাষীদের বিলি বন্টন করেছে। গোমস্তা টাকা নিয়ে প্রজাদের রসিদ দেয়নি। যথাযথ খাজনা দেওয়া সত্ত্বেও চরের সাঁওতাল প্রজাদের রসিদ না দিয়ে সেই জমিকে আবার নিলাম করার বন্দোবস্ত করেছে। তাই গোমস্তার অত্যাচারের স্বীকার হয়ে প্রজারা জমিদারের উপর ক্ষেপে উঠেছে। প্রজা কমলের কথা অনুযায়ী – 'গোমস্তাতে টাকা লিলে, রসিদ দিলে না। খাজনা লিলে আবার জমি লিলেম করালে'।[৮]

তারপর জমিদারসহ প্রজাদের সাথে সঙ্গ দিয়ে মহাজনসহ গোমস্তাদের শায়েস্তা করেছে। গোমস্তাকে তীর দিয়ে আক্রমণ করে, পা কেটে, কোমর থেকে হাত দুটো কেটে বদলা নিয়েছে। কলওয়ালা বিমল মুখার্জি চরের জমি দখল নেবার পর জমিদার রায় বংশের অন্যতম শরিক হরিশ রায় গোমস্তা হিসাবে কাজ করেছে। চরের জমি সম্পর্কিত মামলা-মোকদ্দমার সমস্ত পরামর্শ গোমস্তা হরিশ রায় বিচক্ষণতার সহিত করেছেন। চক্রবর্তী জমিদার বাড়ির গোমস্তা অহীন চক্রবর্তীর বিবাহ উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণ পত্র নিয়ে বিমলবাবুর কাছে পাঠিয়েছেন। অবাক সাঁওতাল প্রজাদেরকে মৌখিকভাবে নিমন্ত্রণ জানানোর দায়িত্বও গোমস্তার উপর ন্যস্ত ছিল। সাঁওতাল প্রজারা জমিদার বাড়ির নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে না পারার কথা জানায় যে, তারা এখন দু'বেলা কাজে ব্যস্ত। গোমস্তা প্রত্যুত্তরে বলেছে – 'যাস নে তাহ'লে'। কিন্তু চূড়া নামক প্রজা মনের বেদনার কথা গোমস্তার কাছে প্রকাশ করেছে। জমিদারবাবু রাগ করবে কিন্তু তাদের তো আজ আর উপায় নেই কেননা জমিদার বাড়ির নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলে প্রজাদেরকে কলের কাজ থেকে বিমলবাবু তাড়িয়ে দেবে বলে আশংকা করে গোমস্তাকে বলেছে – 'তুদের বাড়ি গেলে পরে ইথান থেকে তাঁড়িয়ে দিবে'। তবুও গোমস্তা তাদেরকে অবজ্ঞা করে ধিক্কার জানিয়েছে। বিবদমান দুই জমিদার পরিবারের বিবাদে ও বণিকতন্ত্রের নব অভ্যুত্থানে জমিদার শ্রেণির ক্ষয়িষ্ণু জমিদার শ্রেণিতে পরিণত হয়েছে। ফলে গোমস্তা শ্রেণি চরিতের বিলুপ্তি ঘটেছে ক্রমশ। প্রতিক্রিয়া হীন হয়ে পড়েছে গোমস্তা চরিত্র।

নায়েব:

নায়েব শব্দটির সাধারণ অর্থ জমিদারের প্রতিনিধি বা সহকারী নাজীর। জমিদারের পরিবর্তে উপস্থাপিত ব্যক্তি নায়েব। জমিদার সম্পদ ও শক্তিকে শ্রীবৃদ্ধি ঘটানোর জন্য সে সমস্ত ডানাগুলি ছিল তার মধ্যে অন্যতম নায়েব। যুক্তি তর্ক ও সুপরামর্শ দানের মধ্য দিয়ে জমিদারী ব্যবস্থাকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করতে সাহায্য করত। চাষী, ভাগচাষী, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের নতুন বিধান ও নিয়মের দ্বারা কিভাবে পর্যদস্তু করা যায় তার রূপায়ণ করত নায়েব। প্রজা সকলকে কর্জ্জ বা ধান দাদন দিয়ে তার হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি কাজ নায়েব মারফত সমন্বিত হত। গরীবদের সর্বস্ব গ্রাসের ফাঁদ – খাজনার সুদ, ঋণের সুদ, চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ, এমনকি মানুষকে অন্যায়ভাবে মিথ্যা-মামলা-মোকদ্দমায় ফাঁসিয়ে দেওয়া হত প্রতিনিয়ত। দেবু পণ্ডিত যে স্কুলে পড়াত সেখানে এসেছে কঙ্কনার নায়েবের ছেলে। ম্যাট্রিক পাশ করে ট্রেনিং নিয়েছে, বয়স আঠারো-উনিশ হবে। দেবু ঘোষ পনেরো মাস জেলে যাবার কারণে সেই স্কুলে তার জায়গায় এসেছে নায়েবের ছেলেটি।

'কালিন্দী' উপন্যাসে জমিদার চরিত্রের পরে যে চরিত্রগুলি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে তার মধ্যে নায়েব চরিত্র গুরুত্বপূর্ণ। জমিদারদের জমি রক্ষা, ভূ-সম্পত্তির শ্রীবৃদ্ধি ঘটানো, মামলা-মোকদ্দমার বিষয়ে পরামর্শদাতা হিসাবে নায়েব চরিত্র তার নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করে থাকে। এই উপন্যাসে নায়েব চরিত্র যোগেশ মজুমদার। তিনি রামেশ্বর চক্রবর্তী জমিদারের নায়েব। জমিদারের শারীরিক দৌর্বল্যের কারণে জমির সমস্ত দেখভাল নায়েবই করেন। নায়েবের পরামর্শে জমিদারের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সুনীতি দেবীর বড় ছেলে মহীন্দ্রকে জমিদারীত্বের দায়িত্ব দেন। প্রকারন্তরে জমিদারের সর্বময় কর্তা নায়েব যোগশ মজুমদারই। জমিদারের শারীরিক অবনতি ঘটলে সুনীতি দেবীকে চিকিৎসা করানোর পরামর্শ দিয়ে বলেছে – "একবার আর বৈদ্যপারুলিয়ার কবিরাজদের দেখালে হ'ত না"? তার জমিদারের শারীরিক যন্ত্রণার কথা অনুভব করেছে মর্মে। চরের একশ বিঘে জমি মহীন্দ্রের হুকুমে শ্রীবাসকে টাকার বিনিময়ে বন্দোবস্ত দিয়েছে নায়েব, কিন্তু সেটা পছন্দ না করাই সুনীতি দেবীকে সেই ঘটনা জানিয়েছে।

রায় জমিদার বংশের জমিদারিত্ব মূল দু'ভাবে বিভক্ত হয়ে যায়। কিন্তু নায়েবের দায়িত্ব যোগেশ মজুমদারের। নায়েব কূটকৌশলী, পরাক্রমকারী বিবাদের সাজে কলওয়ালা বিমল মুখার্জিকে নিয়ে চর দখলের চক্রান্তে নেমেছে। চিনির কল বসানোর জন্য চরকে বিমল মুখার্জির হাতে তুলে দেওয়ার সমস্ত পরিকল্পনা করেছে। হেমাঙ্গিনীকে অর্থের লোভ দেখিয়ে ভুল বুঝিয়ে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করেছে। ননী পালকে হত্যা করে মহীন্দ্রর দ্বীপান্তর, রামেশ্বর চক্রবর্তীর শারীরিক অক্ষমতা সুযোগে ও রায় বংশের শ'খানেক শরিকের বিবাদে চরের জমিকে কায়দা করে দখলে চেষ্টা চালিয়েছে। চক্রবর্তী বাড়ির চরে চিনির কল বসানোর জন্য দেখাতে নিয়ে এসেছেন কলওয়ালা বিমল মুখার্জিকে। অন্যদিকে ননী পাল হত্যায় মহীন্দ্রের আইনি পরামর্শের জন্যে সুনীতি দেবীর কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা নিয়েছে নায়েব যোগেশ মজুমদার। সেই টাকা চরের জমি বন্দোবস্ত নিয়েছে। গহনা বিক্রি করে অতি কষ্ঠে জোগাড় করেছে। চক্রবর্তী জমিদার বাড়ির সমস্ত টাকা আত্মসাৎ করেছে। পরবর্তী অর্থ সঞ্চয় করে চক্রবর্তী বাড়ির বিক্রিত সম্পত্তির ও রায় জমিদার পরিবারের শরিক জমিদারের মর্যাদা পেয়েছে। জমিদার পরিবারের সঙ্গে নায়েব যোগেশ মজুমদার এক আসনে উন্নীত হয়েছে আপন কূট কৌশলে। চক্রবর্তী বাড়ির যে ঋণ বেনামী দেওয়া সেটা তার দাবি, তার কাছে ধার হিসাবে জমিদার নিয়ে ছিলেন। সেই ঋণের টাকা পাওয়ার আশায় জমিদার ইন্দ্র রায়ের কাছে অনুযোগ জানিয়েছে। তির্যক ভঙ্গিতে ঈষৎ হেসে ইন্দ্র রায় গম্ভীর নিঃশ্বাস ফেলে বলেছে – "চাকরের কাছে ধার, জানি সে আমার টাকা চুরি ক'রেই আমাকে ধার ব'লে দিয়েছে, কিন্তু সে যখন ধার ব'লেই নিয়েছি – তখন আমার ভগ্নীপতি, কি আমার বহু বেয়াই, কখনও 'দেবে না' বলবেন না"।[৯]

চর দখলকে কেন্দ্র করে জমিদার ইন্দ্র রায় তার কাছারি বাড়িতে নায়েব সেরেস্তা নিয়ে কাগজ পত্র পরীক্ষা করছিলেন। রায় বাড়ির নায়েব মিত্তির তক্তপোষের উপর বসে কাজকর্মের তদারকি ও ইন্দ্র রায়ের কাজের সহায়তায় মগ্ন ছিলেন। ঠিক এমন সময় নানা ভঙ্গিমায় করুণ সুরে বলেছেন ইন্দ্র রায়কে সে, চরের বসবাসকারী সমস্ত সাঁওতালদের দাদন দিয়ে রেখেছেন। আবার শ্রীবাসের কুটবুদ্ধির কথায় স্মরণ করিয়ে বলেছে – "শ্রীবাসের প্যাঁচালো বুদ্ধি তো জানেন, সে আবার ডেমিতে টিপছাপ নিয়ে বন্ধকী দলিল পর্যন্ত করে নিয়েছিল"।[১০] আর মুখার্জি সাহেব শ্রীবাসের কাছে দস্তখতগুলি কিনে নিয়ে, দৈনিক মজুরির বিনিময়ে খেটে পরিশোধ করার অনুমতি দেয়। কিন্তু চিন্তান্বিত দৃষ্টিভঙ্গিতে একথা মানতে না চাইলে নায়েব যোগেশ মজুমদার জমিদারের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েছে। অগ্রহায়ণের শেষে রবি ফসল না বুনলে, চরের বেশির ভাগ জমিই পড়ে থাকবে। অন্যদিকে যোগেশ মজুমদার জমিদারের মুখের উপর প্রতিবাদ জানিয়েছে

– "যারা ভাগীদার নয়, তাঁদেরও আপনারা বেগার ধরেছেন খাসের জমির ধান কাটবার জন্যে"।[১১] জমিদার গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বিস্ফোরিত নেত্রে চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েন। নায়েব যোগেশ মজুমদারের চক্রান্ত, বিমল মুখার্জ্জির ব্যবসায়ী মনোভাব ও অর্থের প্রাবল্যে জমিদার শাসনের অস্তমিত সূর্যে পরিণত হওয়ার আভাস রয়েছে। নায়েব যোগেশ মজুমদার আবার জমিদার ইন্দ্র রায়কে সাবধান করে মুখার্জ্জি সম্পর্কে সচেতন করে বলেছে – "লোকটি বড় ভয়ানক বাবু। ধর্ম-অধর্ম কোন কিছু মানেন না। আর লোকটির কূটবুদ্ধিও অসাধারণ"।[১২] যোগেশ মজুমদার চক্রবর্তী জমিদার বাড়ির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজের সম্পদশালী হয়ে উঠেছে। তা জেনেও চক্রবর্তী বাড়ির ছোট ছেলে অহীনের বিয়ের অনুষ্ঠানের দায়িত্ব পালনের ভার নায়েবকে দিয়েছেন। তাকে ধুতি ও গরমের চাদর দিয়ে জমিদার ইন্দ্র রায় সম্মান জানিয়েছে। কর্মচারী হয়েও সে এখন জমিদার রামেশ্বর চক্রবর্তীর সমতুল্য ব্যক্তিত্ব, তবুও তাকে এখনও ভাইয়ের মতো স্নেহ করে।

ইন্দ্র রায় খাজনা আদায় করতে গেলে অচিন্ত্যবাবু সাঁওতাল প্রজাদের খাজনা দিতে নিষেধ করেছে। নায়েবও গম্ভীর স্বরে বাগদী পাইকদের ডেকে সাঁওতাল প্রজা সকলকে সাবধান করে দিয়েছে যে, তাদের প্রজাস্বত্ব এখন বিমল মুখার্জ্জি বাবুর। তিনি এখন সাঁওতাল প্রজাদের মা-বাবা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। এইভাবে সাঁওতাল প্রজারা বিভ্রান্ত হয়ে জমিদারকে ত্যাগ করেছে। জমিদার ও বিমল মুখার্জ্জির মধ্যে যে মামলা শুরু হয়েছিল চরের জমিকে কেন্দ্র করে। সেই সমস্ত মামলা-মোকদ্দমায় প্রত্যেকটি জমিদার পক্ষের পরাজয় ঘটেছে। চর দখলকে কেন্দ্র করে চাষীদের জমি দখল করলে জমিদার ইন্দ্র রায় আবার তার নায়েব মিত্তির কে কেসে লড়ার নির্দেশ দেন। জোরপূর্বক বিমল মুখার্জ্জি চাষীদের জমি চষে নেওয়ার অপরাধে। জলদি, বাগদি, কাহার চাষীদের এক জায়গায় করে কলওয়ালা বিমল বাবুর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে নায়েব মিত্তির। যোগেশ মজুমদার (নায়েব) মহীন্দ্রের হুকুম মতো একশো বিঘে জমির বন্দোবস্ত করেছেন ছ'শ টাকায়। কূটকৌশলী, ধুরন্ধর নায়েব জমিদারকে ফাঁকি দিয়ে, বিশ্বাসঘাতকতা করে ধ্বংস করতে চেয়েছে জমিদারকে। জমিদার পত্নী সুনীতি দেবীর সরলতার সুযোগ নিয়ে ভুল বুঝিয়ে সর্বস্ব হস্তগত করেছে। তাই জমিদার বাড়ির হাল জরাজীর্ণ ও সংকটাপন্ন ও ক্রমশ অবক্ষয়িত হয়েছে।

লাঠিয়াল:

জমিদারের তাল গাছের ডাল কাটাকে কেন্দ্র করে বিবাদ বাঁধে প্রজাদের সাথে। পূর্বের জমিদারদের নিয়ম অনুযায়ী জমিতে যে চাষি বা প্রজা চাষ করবে সে গাছের ফল বা ডাল কাটতে পারে, এরকমই হয়ে আসছে দীর্ঘদিন যাবৎ। কোনোদিন জমিদারের বাঁধা দেয়নি এমন গাছের ফল নেওয়ার ইচ্ছে থাকলে মিষ্ট ভাষায় বাক্যালাপ করে চেয়ে নিত। কিন্তু বর্তমান জমিদার শ্রীহরি পালের জমিদারী শাসনে তার বিরোধিতা করেছে। সকল প্রজা ও চাষী একত্রিত ভাবে বিরোধিতা করতে গেলে লাঠিয়াল, পাইক লাগিয়ে ধরে এনে চণ্ডীমণ্ডপে মজলিশ বসিয়েছে। সামান্য তালপাতাকে কেন্দ্র করে মামলা-মোকদ্দমায় ফাঁসিয়েছে প্রজাদের। পঞ্চাশ জন লাঠিয়াল দিয়ে শায়েস্তা করার হুমকি দিয়েছে। জোর পূর্বক তালগাছের ডাল লাঠিয়ালদের দিয়ে কেড়ে নিয়ে প্রজাদেরকে হেনস্থা করেছে। প্রজারা তালগাছের ডাল হাতে তুলে নিলেও লাঠিয়ালদের প্রহারে সব প্রজা রেখে দিলেও অনিরুদ্ধ ধরে থাকার কারণে তাকে ভিটে মাটি ছাড়া করেছে। কৌশল করে খাজনার দায়ের তার জমি নিলামে তুলেছে। লাঠিয়াল বাহিনীর আর একটি রূপ হিসাবে পুলিশ প্রশাসন ব্যবহার করেছে। পুলিশ দিয়ে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে প্রজাদেরকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। এমনকি প্রজাস্বত্বের অধিকার টুকুও পায় নি।

ছিরু পাল তার দ্বিতীয় পর্যায় বা জমিদার জীবন পদার্পণের পূর্বে গোমস্তা গিরি পাওয়ায় চৌকিদার ভূপালকে দিয়ে তার মনোমত কার্যক্রম চালানো সম্ভব নয় বলে পাশের গ্রামের বাড়ুজ্জ্যে বাড়ির চাপরাশি নাদের সেখের ছেলে লাঠিয়াল কালু সেখকে নিয়ে এসেছে। নাদের সেখ এককালে যেমন বিখ্যাত লাঠিয়াল হিসাবে বিশেষ পরিচিত ছিল ঠিক তার ছেলে কালু সেখও দোর্দণ্ডপ্রতাপ লাঠিয়াল হিসাবে নামকরা। যেমন শক্তিশালী জোয়ান তেমনি দুর্দান্ত সাহসী, খ্যাতি হিসেবে সে মারামারি করে একবার জেলও খেটে এসেছে। ডাকাতির অপরাধেও সে গ্রেপ্তার হয়েছে। এই নব নিযুক্ত লাঠিয়াল কালু সেখকে নির্দেশ দিয়েছে জমিদারের সরকারী বাঁধে কিংবা পতিত জমিতে কারো গরু প্রবেশ করলে কঙ্কনার ইউনিয়ান বোর্ডে খোয়াড় দিয়ে আসতে বলেছে। নব নিযুক্ত লাঠিয়াল কালু সেখ মনিবকে নিজের কাজের দক্ষতা দেখাতে উদ্যত হয়েছে আপন মহিমায়। মাটিতে সালাম দিয়ে মনিবের হুকুম পালনে তৎক্ষণাৎ আগ্রাসী হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে চৌকিদার ভূপাল শ্রীহরির অনুগত গরু গুলি চিনিয়ে দিয়ে বাকী গরু গুলি খোঁয়াড় দিতে উপদেশ দিয়েছে।

জমিদার ও তাঁর পরিবারের নিরাপত্তা, জোরপূর্বক শাসনকে প্রতিষ্ঠা করা একমাত্র নির্ভরতা ছিল লাঠিয়ালদের উপর। জমিদার, নায়েব, গোমস্তার পরামর্শর মধ্য দিয়ে শাসন পরিচালনা চলত আর সেই শাসন পদ্ধতিকে কার্যকরী ভূমিকায় রূপদান করতে মাঠে নামত লাঠিয়াল বাহিনী। জমিদার তাঁর ভূ-সম্পত্তির শ্রীবৃদ্ধির জন্য লাঠিয়াল বাহিনী পুষত। প্রয়োজন অনুসারে তাদের কাজে লাগিয়ে দুর্দমনীয় মনোভাব প্রতিষ্ঠা করত লাঠিয়ালদের মারফৎ। ‘কালিন্দী’ উপন্যাসে লাঠিয়ালদের ভূমিকা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখা যায় রামেশ্বর চক্রবর্তী ও রায় বংশের জমিদারী ভাগ বাটোয়ারাকে কেন্দ্র করে বিরোধ শুরু হয়। কালিন্দী নদীর চরে সাঁওতালরা আগাছা পরিষ্কার করে বসবাস করতে শুরু করলে জমিদারের নির্দেশে লাঠিয়াল বাহিনী তাদেরকে কাছারি বাড়িতে আটক করে রেখেছে। এক সঙ্গে সাত আট জন লাঠিয়াল গর্জন করে সাঁওতালদের মুখকে বন্ধ করেছে।

কালিন্দী নদীর চরকে কেন্দ্র করে রক্তাক্ত হয়েছে বারংবার রায়হাট গ্রাম। মামলা-মোকদ্দমা শুরু হয়েছে নানা রকমের। চাষী শ্রীবাস সাঁওতালদেরকে দাদন দিয়ে তাদের একশ বিঘে জমিতে দস্তখত লিখে নিয়েছে। আর এই খতকে কেন্দ্র করে রংলাল, নবীনসহ চার-পাঁচজনের সঙ্গে শ্রীবাসের কয়েকজন লাঠিয়ালের সংঘাত বেঁধেছে। জমিদার পক্ষের লাঠিয়াল নবীন বাগদীকে নর হত্যার কেসে ফাঁসিয়ে দিয়েছে শ্রীবাস। অন্যদিকে নায়েব মজুমদারের তদারকিতেও অর্থের প্রাচুর্যে শ্রীবাস আইনের চোখে নির্দোষ বলে প্রমাণিত হয়েছে। চক্রবর্তী জমিদার বংশের ছোট ছেলে অহীন তার বিয়ের অনুষ্ঠানে স্মৃতি চারণায় নবীন বাগদী কথা স্মরণে আনে যে নবীনের লাঠির আঘাতে শ্রীবাসের লাঠিয়ালের মাথা ফাটিয়েছে, সে থাকলে তার বিনিময়ে হয়তো বকশিস চাইত লুচি মিষ্টি।

চরের জমিকে কেন্দ্র করে জমিদার ইন্দ্র রায়ের সঙ্গে বিমল বাবুর যে মামলা-মোকদ্দমা চলছিল তাতে সবকটি মামলায় জমিদার পক্ষের পরাজয় ঘটেছে। বিমল চাষিকে উচ্ছেদ করে চরের সমস্ত জমি মোটর-লাঙ্গল দিয়ে চাষ দিলে তার বিরুদ্ধে ইন্দ্র রায় আবার মামলা করেছে। সাঁওতাল, বাগদি, জলদি, কাহার সম্প্রদায়ের সামিল করে বিমলবাবুর জমি চাষকে বন্ধ করতে লাঠিয়ালদের সাহায্যে নেয়। জমিদার ইন্দ্র রায় লাঠিয়াল দিয়ে, টাকা পয়সা খরচ করে বিমলবাবুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। প্রজাদের সাহস দিয়ে বলেছে লাঠিয়াল নামিয়ে চরের জমিকে বাঁচাতে হবে।

তথ্যসূত্র:

১। পঞ্চগ্রাম – তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা – ৭০০০৭৩, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪১৮, পৃষ্ঠা-২১৫।

২। গণদেবতা – তারাশঙ্কর রচনাবলী (৩য় খণ্ড) সম্পাদক শ্রীগজেন্দ্র কুমার মিত্র, শ্রী সুমথনাথ ঘোষ, শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা – ৭০০০৭৩, একাদশ মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪১৭, পৃষ্ঠা-৫৮।

৩। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৫৮।

৪। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৫৯।

৫। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৬৬।

৬। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৭৯।

৭। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-১২৬।

৮। কালিন্দী – তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (২য় খণ্ড) – সম্পাদক শ্রীগজেন্দ্র কুমার মিত্র, শ্রী সুমথনাথ ঘোষ, শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা – ৭০০০৭৩, দশম মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪১৭, পৃষ্ঠা-৬৬।

৯। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-১৪৩।

১০। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-১৫৩।

১১। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-১৫৩।

১২। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-১৫৪।